প্র কা শ না র ৬০ ব ছ র
Sangbad Online
সংবাদ
Date: 22.10.2018 Page: 07

দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উফশী ও হাইব্রিড জাতের অবদান

ড. মো. শাহজাহান কবীর

বনভূমি, উদ্ভিদরাজি, বনের পশু, প্রাকৃতিক জলাশয় ও সমুদ্রের প্রাণিসম্পদ এসবের ওপর নির্ভর করে আর দশটি প্রাণীর মতোই মানুষের জীবন চলা শুরু হয়। কিন্তু প্রকৃতি প্রদত্ত মেধা ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষমতায় মানুষ সবার থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। তাই প্রয়োজনের তাগিদে তাকে জীবন ধারণের জন্য সহজতর উপায় খুঁজে নিতে হয়। আর সেটাই হলো কৃষি। তবে দেখতে হবে যতটা কম পড়ে। কৃষি একটি গবেষণা নির্ভর প্রায়োগিক বিজ্ঞান-যার শুরু সেই দশ হাজার বছর আগে থেকে। নারীর হাত দিয়েই কৃষির শুরু। নারীকে এ ব্যাপারে অবিরত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ দুটোই করতে হয়েছে। সঙ্গে নিশ্চয় পুরুষও ছিল। সেখানে প্রয়োজনের তাগিদেই কম-উৎপাদনশীল উদ্ভিদকে কিভাবে বেশি উৎপাদনশীল করা যায় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। তাদের হাতেই সম্ভাবনাময় জংলী উদ্ভিদ থেকে প্রজনন প্রক্রিয়ায় যুগপোযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এজন্য উপর্যুপরি প্রাকৃতিক নির্বাচন, পছন্দের জাতগুলোর মধ্যে সংকরীকরণ, কি করা হয়নি! এ কথা যেমন ফসলের বেলায় সত্যি তেমনই পশুপালনের বেলায়ও সত্যি। আর এই সংকরীকরণ দিয়েই তো জেনেটিক্যালি মোডিফাইড প্রযুক্তির শুরু। সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বাণিজ্যিক কৃষি ও তার করপোরেট চরিত্র নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে এই বাণিজ্যিক কৃষির শুরুটাও কিন্তু অনেক আগে। বিনিময় বাণিজ্যের শুরু তো কৃষিকে দিয়েই।

খরা-ঝরার দেশ ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক বৈরী পরিবেশের কারণে ফসলহানি নতুন কোন বিষয় ছিল না। ব্রিটিশ-ভারতের আবহাওয়াবিদদের মতে প্রতি সাতটা ভালো মওসুমের সঙ্গে দুটো খারাপ মওসুম দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতি ১২ বছরে একবার মারাত্মক আকারে আকাল (দুর্ভিক্ষ) পড়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইংরেজি : Bengal famine of ১৭৭০) বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি.) এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয়। ১৮৬৯-৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী দুর্ভিক্ষে তখনকার বাংলাদেশের এক কোটি মানুষ মারা যায়। লর্ড হেস্টিংসের মতে এই সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ। ১৮৭৬-৭৮ সালে সারা ভারতে প্রায় ছয় কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয় এবং ৫২,৫০,০০০ জন মারা যায়। এসব কারণেই ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আর এ চিন্তা থেকেই কৃষি উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় যার অন্যতম বিষয় হলো কৃষি গবেষণার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

ব্রিটিশ কলোনিয়াল সরকার ১৯০৫ সালে বিহারের পুষা শহরে রাজকীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৪ এর প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে উক্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে ১৯৩৬ এ যাবতীয় কার্যক্রম দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। পাশাপাশি ঢাকাতেও একটি গবেষণা খামার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৯০৬ সালে ঢাকার অদূরে তেজগাঁয় ৩৫৩.০৭ একর জমি কেনা হয় এবং এখানেই ধান, গম, ভুট্টাসহ তেল ও ডাল ফসল, আঁশ জাতীয় ফসল, ফলমূল, শাক-সবজি এবং সেগুলোর কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সেচ কার্যক্রম, গবাদিপশুর উন্নয়নসহ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে ধান নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। তখনকার ধান গবেষণার পরিধি ছিল ধানের বাস্তুসংস্থান, পূর্ববঙ্গে আবাদকৃত সমস্ত ধানের শ্রেণীবিন্যাস, জাত-উন্নয়ন কার্যক্রম, জাত বাছাই, নতুন জাত অন্তর্ভুক্তি, সংকরীকরণ বিষয়ক গবেষণা ও আবাদ পরিচর্যা। এসব কার্যাক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ ফলনশীল এবং বালাই প্রতিরোধী ধানের জাত উদ্ভাবন করা। ১৯৩৪ সালে আসামের (তৎকালীন) হবিগঞ্জে শুধু বোরো ধান ও জলি আমন ধান নিয়ে গবেষণার জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত গবেষণা কার্যক্রম থেকে নির্বাচিত/উদ্ভাবিত জাতগুলোই ছিল তখনকার যুগের স্থানীয় উন্নত জাত (LIV) যার বেশিরভাগই সরাসরি নির্বাচিত এবং কিছু ভূমিস্থত জাতের (Land Race) সংকরীকরণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।

সেই আমলের নির্বাচিত আউশের জাত কটকতারা, সূর্যমুখী, চারনক, পুখি, আতলাই, পানবিরা, ধারিয়াল, কুমারী, পাশপাই, মরিচবটি, হরিণমুড়া, ধলা ষাইটা (দুই রকমের), খাসিয়া পাঞ্জা পুসর (সংকরীকৃত জাত), দুলার (সংকরীকৃত জাত)। আমনের জাত ইন্দ্রশাইল, ঢেপি, দুধসর, তিলককাচারি, দাউদখানি, যেশোবালাম, হাতিশাইল, ঝিঙ্গাশাইল, লতিশাইল, নাইজারশাইল, রূপাশাইল, বাদশাভোগ, ভাসামাণিক, বাদকলমকাঠি, চিংড়িঘুশি, পাটনাই২৩, খিরাইজলি, রাজাশাইল, বাশফুল, সংকরীকৃত জাত দাউদিন, জিন্নাহ্ শাইল, ইসা শাইল, লিয়াকত শাইল, জলি আমনের জাত কাত্যাবাগদার, গদালাকি, গোয়াই, দুধ লাকি, ধলা আমন, লাল আমন, এবং বোরোর জাত টুপা বোরো, খইয়া বোরো, বনজিরা, পশুশাইল আমাদের পূর্বসুরি বিজ্ঞানীদের কষ্টার্জিত ফসল। এগুলোর অধিকাংশই ছিল তাদের সংগৃহীত শত শত দেশি ধানের জাত থেকে বাছাই করা অধিক ফসলশীল জাত। তবে তাদের ফলন কোনক্রমেই হেক্টর প্রতি ২-২.৫ টনের বেশি ছিল না।

জাপান ও তাইওয়ানে ১৯৪০-এর দশকে 'উন্নত জাতের' ধান বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ফিলিপাইনেও এই গবেষণা চলতে থাকে। ১৯৫০-এর দশকেই রকফেলার ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা এশিয়ার খাদ্য উন্নয়নের বিষয়টি গভীরভাবে মনোযোগে আনেন। যেহেতু ধান হচ্ছে এশিয়ার প্রধান খাদ্যশস্য, তাই রকফেলার ফাউন্ডেশনও ধান গবেষণায় আগ্রহী হয়। রকফেলার ফাউন্ডেশনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কৃষি বিভাগের ওয়ারেন ওয়েভার এবং ডেপুটি পরিচালক জে. জর্জ হেরার ১৯৫২-৫৩ সালে এশিয়া ভ্রমণ করেন। পরে এশিয়ায় ইরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফাউন্ডেশনের কাছে প্রস্তাব দেন।

ফিলিপাইনের লসব্যানসে অবস্থিত ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজের ধান পরীক্ষণ মাঠকে কাজের সঙ্গে সংযুক্ত করে লসবানসে ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ইরি। মেক্সিকান নরিন ১০ গমের অভিজ্ঞতায় ইরির বিজ্ঞানীরা খর্বাকৃতির উচ্চফলনশীল ধান জাত উদ্ভাবনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দশ হাজার স্থানীয় ধানজাত সংগ্রহ করেন। ইরির প্রজননবিদ ও বিজ্ঞানীরা একটি বড় পরিসরে ধান প্রজনন কার্যক্রম শুরু করেন। খর্বাকৃতির ধানজাতের সঙ্গে লম্বাকৃতির ধানজাতের সংকরায়ণ ঘটিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার একটি স্থানীয় ধানের জাত পেটা ডব্লিউ যা ফিলিপাইনের বিভিন্ন এলাকাতেও জন্মায়, সেটি সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে চীনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা তাইওয়ানের একটি স্থানীয় খর্বাকৃতির ধানজাত ডি-জিও-উও-জেনকেও সংকরায়ণের জন্য সংগ্রহ ও বাছাই করেন বিজ্ঞানীরা। তাজ্জব ব্যাপার হলো, আমাদের পূর্বসুরি বিজ্ঞানীদের বাছাই করা লতিশাইল তাইওয়ানিজ বিজ্ঞানীরা তাদের পছন্দের দি-জিউ-ওই-জেন উদ্ভাবনের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। পরে এই দি-জিউ-ওই-জেন ও ইন্দেনেশিয়ার পেটা ডব্লিউ জাতের ৮নং ক্রস থেকে অলৌকিক ধান আইআর-৮ এর জন্ম। অতএব আইআর-৮ এর পিতৃসারি বা মাতৃসারি আমাদের দেশীয় জাত থেকেই এসেছে। এগুলো কোন বিজ্ঞানীর উদ্ভট আবিষ্কার ছিল না। ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

দুই এলাকার দুটি স্থানীয় ধানজাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয় ইরিতে সেটিই হলো আইআর-৮। ১৯৬৬ সালে ইরির মাধ্যমে এই নতুন ধান জাতটিকে এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়ার প্রদর্শনী খামারে উৎপাদনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে তখনকার পাকিস্তানের প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে ইরি-৮ ধানের চাষ হয়। ১৯৬৮ সালে ইরি-৮ ধানের চাষের এলাকা প্রায় ১০ লাখ একর ছাড়িয়ে যায়। ১৯৬৪ সালে ফোর্ড ও রকফেলার ফাউন্ডেশন ইরিকে যৌথ অংশীদারির ভিত্তিতে আর্থিক সহযোগিতা করতে চুক্তিবদ্ধ হয়। আইআর-৮ ধানটি পতঙ্গসহনশীল ছিল, ইন্দোনেশিয়াতে এটি মূলত বাদামি ঘাসফড়িংয়ের প্রতি বেশি সহনশীল ছিল।

সবুজ বিপ্লবের শুরু এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের মূল ধারণা এখান থেকেই উঠে আসে। রকফেফলার ফাউন্ডেশনে কাজ করতেন ড. জে. জর্জ হারার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনে ফরেস্ট এফ. হিল। কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. হিল ১৯৫১ সালের কোন এক সভায় বলেছিলেন 'At best the world food outlook for the decades ahead is grave; at worst, it frightening.' সে সময় এশিয়ার ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর গড় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ১.৪ টন। পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিল ২৫০ কোটি। বিংশশতাব্দী শেষ হতেই লোক সংখ্যা দাঁড়াবে ৬০০ কোটিতে। ড. হারার ১৯৪৩ থেকে মেক্সিকোতে গম উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষের বাংলাদেশে তখন ভয়াল দুর্ভিক্ষ। অমর্ত্য সেন এই দুর্ভিক্ষের যে কারণই ব্যাখ্যা দিন না কেন তার অন্যতম কারণ ছিল আমন ধানের "Brown spot disease" (Dr S. Y. Padmanabhan; Annual Review of Phytopathology: 1973, Vol: 11:11-24). ড. পদ্মনাভন এই দুর্ভিক্ষকে কুখ্যাত "Irish Famine" এর সাথে তুলনা করেছিলেন। যার কারণ ছিল আলুর Late blight of potato রোগ।

ড. নরমান বোরলগ এর কর্মদক্ষতায় ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি মেক্সিকো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। পাশাপাশি এই কার্যক্রম ভারত বর্ষ ও পাকিস্তানে সম্প্রসারিত হয়। গম উৎপাদনে এ দুদেশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. বোরলগকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এখানে বলতে হয়, বিজ্ঞানীরা যদি শুধুমাত্র ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে গবেষণা না চালিয়ে যেতেন, তাহলে মেক্সিকোকে রক্ষা করা সম্ভব হতো না। ভারত ও পাকিস্তানের (বাংলাদেশ সহ) অজস্র মানুষ অনাহারে মারা যেত। ১৯৪৩ এর মন্বন্তর বা Irish Famine এর পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকত। এমনকি পরবর্তীতে সারাবিশ্বে ধান ও গম উৎপাদনে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে সেটাও সম্ভব হতো না। যা হোক সভাশেষে দুই বিজ্ঞানী (হিল এবং হারার) চা পানের সময় আলোচনা তোলেন। ড. হিল শুরু করেন, You know, George, some one should undertake to work with rice the way you Rockfeller Foundation people have with corn and wheat". ড. হিলের শেষ কথা ছিল, 'আমাদের কিছু অর্থ আছে, তোমাদের আছে অভিজ্ঞতা। চলনা এক সঙ্গে কিছু করি।' ড. হারার পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক। ড. রবার্ট এফ শ্যান্ডলার জুনিয়র এর ভাষায়-এভাবেই আধুনিক ধান গবেষণার গোড়াপত্তন হয়। এখানে অনুন্নত দেশগুলোর প্রতি রকফেলার বা ফোর্ডফাউন্ডেশনের কূট-কৌশল বা বিশ্বব্যাঙ্কেও ঋণকার্যক্রমের আড়ালে উচ্চ ফলনশীল বীজ নির্ভর প্রযুক্তি চাপিয়ে দেয়ার যে অপব্যাখ্যা আমরা দেখি তা মেনে নেয়া যায় না।

(আগামীকাল সমাপ্য)